إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾
تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿٨١﴾
وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا
تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَ
رَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾
فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ
الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ
هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

سورة الحديد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

(৭৭) নিশ্চয় এটা সম্মানিত কোরআন, (৭৮) যা আছে এক গোপন কিতাবে, (৭৯) যারা পাক-পবিত্র, তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না। (৮০) এটা বিশ্ব-পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৮১) তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে? (৮২) এবং একে মিথ্যা বলাকেই তোমরা তোমাদের ভূমিকায় পরিণত করবে? (৮৩) অতঃপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয় (৮৪) এবং তোমরা তাকিয়ে থাক, (৮৫) তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি; কিন্তু তোমরা দেখ না। (৮৬) যদি তোমাদের হিসাব-কিতাব না হওয়াই ঠিক হয়, (৮৭) তবে তোমরা এই আত্মাকে ফিরাও না কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও? (৮৮) যদি সে নৈকট্যশীলদের একজন হয়; (৮৯) তবে তার জন্যে আছে সুখ, উত্তম রিযিক এবং নেয়ামতে ভরা উদ্যান। (৯০) আর যদি সে ডানপার্শ্বস্থদের একজন হয়, (৯১) তবে তাকে বলা হবেঃ তোমার জন্যে ডানপার্শ্বস্থদের পক্ষ থেকে সালাম। (৯২) আর যদি সে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের একজন হয়, (৯৩) তবে তার আপ্যায়ন হবে উত্তপ্ত পানি দ্বারা। (৯৪) এবং সে নিক্ষিপ্ত হবে অগ্নিতে। (৯৫) এটা ধ্রুব সত্য। (৯৬) অতএব, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন।

সূরা আল-হাদীদ

মদীনায় অবতীর্ণঃ আয়াত ২৯

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু।

(১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি শক্তিধর; প্রজ্ঞাময়। (২) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (৩) তিনিই প্রথম, তিনিই সর্বশেষ, তিনিই প্রকাশমান ও অপ্রকাশমান এবং তিনি সববিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ —যে বিষয়বস্তু বর্ণনা করার উদ্দেশ্য পূর্ববর্তী আয়াতে শপথ করা হয়েছিল, এখান থেকে তাই বর্ণিত হচ্ছে। এর সারমর্ম এই যে, কোরআন পাক সম্মানিত ও সংরক্ষিত কিতাব এবং মুশরিকদের এই ধারণা মিথ্যা যে, কোরআন কারও রচিত অথবা শয়তানকর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট কালাম। নাউযুবিল্লাহ!

فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ —অর্থাৎ, গোপন কিতাব। একথা বলে লওহে-মাহ্ফূয বোঝানো হয়েছে। لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ এখানে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। তফসীরবিদগণ এসব বিষয়ে মতভেদ করেছেন। (এক) ব্যাকরণিক দিক দিয়ে এই বাক্যের দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। প্রথম এই যে, এটা কিতাব অর্থাৎ, 'লওহে-মাহ্ফূযের'ই দ্বিতীয় বিশেষণ এবং لَا يَمَسُّهُ এর সর্বনাম দ্বারা লওহে-মাহ্ফূযই বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, গোপন কিতাব অর্থাৎ, লওহে-মাহ্ফূযকে পাক-পবিত্র লোকগণ ব্যতীত কেউ স্পর্শ করতে পারে না। এমতাবস্থায় مطهرون অর্থাৎ, 'পাক-পবিত্র লোকগণ'— এর অর্থ ফেরেশতাগণই হতে পারে, যারা 'লওহে-মাহ্ফূয' পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম। এ ছাড়া مس শব্দটিকে তার আসল অর্থে নেয়া যায় না; বরং مس তথা স্পর্শ করার রূপক অর্থ নিতে হবে, অর্থাৎ লওহে-মাহ্ফূযে লিখিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া। কেননা, লওহে-মাহ্ফূযকে হাতে স্পর্শ করা ফেরেশতা প্রমুখ সৃষ্টজীবের কাজ নয়। (কুরতুবী) তফসীরের সার-সংক্ষেপে এই অর্থ ধরেই তফসীর করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য অর্থ এই যে, এ বাক্যটি إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ বাক্যে অবস্থিত সম্মানিত শব্দটি কোরআনের বিশেষণ। এমতাবস্থায় لَا يَمَسُّهُ এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হবে। কোরআনের অর্থ হবে সেই কপি যাতে কোরআন লিখিত আছে এবং مس শব্দটি হাতে স্পর্শ করার আসল অর্থে থাকবে। কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদগণ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেনঃ আমি এই আয়াতের যত তফসীর শুনেছি, তন্মধ্যে এই তফসীরই উত্তম। এর মর্মও তাই, যা সূরা আবাসের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহেরমর্ম— فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ (কুরতুবী রুহুল-মা'আনী)

এর সারমর্ম এই যে, আলোচ্য বাক্যটি كِتَابٍ مَكْنُونٍ এর বিশেষণ নয়; বরং কোরআনের বিশেষণ।

(দুই) দ্বিতীয় প্রণিধানযোগ্য বিষয় এখানে এই যে, مطهرون অর্থাৎ, 'পাক-পবিত্র' কারা? বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তফসীরবিদগণের মতে এখানে ফেরেশতাগণকে বোঝানো হয়েছে, যাঁরা পাপ ও হীন কাজকর্ম থেকে পবিত্র। হযরত আনাস, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই উক্তি করেছেন। (কুরতুবী, ইবনে-কাসীর) ইমাম মালেক (রহঃ) ও এই উক্তিই পছন্দ করেছেন। — (কুরতুবী)।

কিছুসংখ্যক তফসীরবিদ বলেনঃ কোরআনের অর্থ কোরআনের লিখিত কপি এবং مطهرون এর অর্থ এমন লোক, যারা 'হদসে-আসগর' ও 'হদসে-আকবর' থেকে পবিত্র। বে-ওযু অবস্থাকে 'হদসে-আসগর' বলা হয়। ওযু করলে এই অবস্থা দূর হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বীর্যস্খলনের

পরবর্তী অবস্থা এবং হায়েয ও নেফাসের অবস্থাকে 'হদসে-আকবর' বলা হয়। এই হদস থেকে পবিত্র হওয়ার জন্যে গোসল করা জরুরী। এই তফসীর হযরত আতা, তাউস, সালেম ও বাকের (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে।—(রুহুল-মা'আনী)।

এমতাবস্থায় لَا يَمَسُّهُ এই সংবাদসূচক বাক্যটির অর্থ হবে নিষেধসূচক। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পবিত্রতা ব্যতীত কোরআনের কপি স্পর্শ করা জায়েয নয়। পবিত্রতার অর্থ হবে বাহ্যিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হওয়া, বেওযু না হওয়া এবং বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থা না হওয়া। কুরতুবী এই তফসীরকেই অধিক স্পষ্ট বলেছেন এবং তফসীরে-মাযহারীতে এ ব্যাখ্যাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি ভগ্নি ফাতেমাকে কোরআন পাঠরতা অবস্থায় পেয়ে কোরআনের পাতা দেখতে চান। ভগ্নি আলোচ্য আয়াত পাঠ করে কোরআনের পাতা তাঁর হাতে দিতে অস্বীকার করেন। অগত্যা তিনি গোসল করতঃ পাতাগুলো হাতে নিয়ে পাঠ করেন। এই ঘটনা থেকেও শেষোক্ত তফসীরের অগ্রগণ্যতা বোঝা যায়। যেসব হাদীসে অপবিত্র অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোকেও কেউ কেউ এই তফসীরের সমর্থনে পেশ করেছেন।

যেহেতু এই প্রশ্নে হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী মতভেদ করেছেন ; তাই অনেক তফসীরবিদ অপবিত্র অবস্থায় কোরআন পাক স্পর্শ করার নিষেধাজ্ঞা সপ্রমাণ করার জন্যে এই আয়াতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন না। তাঁরা এর প্রমাণ হিসেবে কয়েকটি হাদীস পেশ করেন মাত্র। হাদীসগুলো এই ঃ

হযরত আমর ইবনে হযমের নামে লিখিত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর একখানি পত্র ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁর মুয়াত্তা গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে একটি বাক্য এরূপও আছে لايمس القران الاطاهر অর্থাৎ, অপবিত্র ব্যক্তি যেন কোরআনকে স্পর্শ না করে।—(ইবনে-কাসীর)

রুহুল-মা'আনীতে এই রেওয়ায়েত মুসনাদে আবদুর রাযযাক, ইবনে আবী দাউদ ও ইবনুল মুনযির থেকেও বর্ণিত আছে। তিবরানী ও ইবনে-মরদুওয়াইহি বর্ণিত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমরের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ لايمس القران الاطاهر —(রুহুল-মা'আনী)

মাসআলা ঃ উল্লেখিত রেওয়ায়েতসমূহের ভিত্তিতে অধিকাংশ উম্মত এবং ইমাম চতুষ্টয় এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাক স্পর্শ করার জন্যে পবিত্রতা শর্ত। এর খেলাফ করা গোনাহ্। পূর্ববর্ণিত সকল পবিত্রতাই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী, ইবনে মসউদ, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, সায়ীদ ইবনে যায়দ, আতা, যুহরী, নাখয়ী, হাকাম, হাম্মাদ, ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবু হানীফা প্রমুখ সবাই এই ব্যাপারে একমত। উপরে যে মতভেদ বর্ণিত হয়েছে, তা কেবল মাসআলার দলীলে, আসল মাসআলায় নয়। কেউ কেউ কোরআনের আয়াত এবং উল্লেখিত হাদীসের সমষ্টি দ্বারা এই মাসআলাটি সপ্রমাণ করেছেন এবং কেউ কেউ শুধু হাদীসকেই দলীল হিসেবে পেশ করেছেন। সাহাবীদের মতভেদের কারণে তাঁরা আয়াতকে দলীল হিসেবে পেশ করা থেকে বিরত রয়েছেন।

মাসআলা ঃ কোরআন পাকের যে গিলাফ মলাটের সাথে সেলাই করা, তাও ওযু ব্যতীত স্পর্শ করা সর্বসম্মতভাবে না-জায়েয। তবে আলাদা কাপড়ের গিলাফে কোরআন পাক বন্ধ থাকলে ওযু ব্যতীত তাতে হাত লাগানো ইমাম আবু 'হানীফার মতে জায়েয। ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (রহঃ)-এর মতে তাও না-জায়েয।—(মাযহারী)

মাসআলা ঃ বে-ওযু অবস্থায় পরিধেয় কাপড়ের আস্তিন অথবা আঁচল দ্বারা কোরআন পাক স্পর্শ করাও জায়েয নয়, রুমাল দ্বারা স্পর্শ করা যায়।

মাসআলা ঃ আলেমগণ বলেন ঃ এই আয়াত দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে, বীর্যস্খলনের পরবর্তী অবস্থায় এবং হায়েয ও নেফাসের অবস্থায় কোরআন পাক তেলাওয়াত করাও জায়েয নয়। গোসল করার পর জায়েয হবে। কারণ, কপিতে লিখিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব হলে মুখে উচ্চারিত শব্দাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা আরও বেশী ওয়াজিব হওয়া দরকার। কাজেই বে-ওযু অবস্থায়ও তেলাওয়াত নাজায়েয হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হযরত ইবনে-আব্বাসের হাদীস এবং মুসনাদে আহ্মদে বর্ণিত হযরত আলীর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বে-ওযু অবস্থায় তেলাওয়াত করেছেন। এ কারণে ফেকাহ্বিদগণ এর অনুমতি দিয়েছেন।—(মাযহারী)

أَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ أَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ – مدهنون শব্দটি ادهان থেকে উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ তেল মালিশ করা। তেল মালিশ করলে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নরম ও শিথিল হয়। তাই এই শব্দটি অবৈধ ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করা ও কপটতা করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এই শব্দটি কোরআনী আয়াতের ব্যাপারে কপটতা ও মিথ্যারোপ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ وَأَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ فَلَوْلَآ إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ تَرْجِعُوْنَهَآ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে যুক্তিভিত্তিক প্রমাণাদি দ্বারা ও পরে নক্ষত্ররাজির কসম করে দু'টি বিষয় সপ্রমাণ করা হয়েছে। (এক) কোরআন আল্লাহ্র কালাম। এতে কোন শয়তান বা জিনের প্রভাব থাকতে পারে না। এর বিষয়বস্তু সত্য। (দুই) কেয়ামত সংঘটিত হবে এবং সব মৃত পুনরুজ্জীবিত হয়ে আল্লাহ্র সামনে নীত হবে। পরিশেষে এসব সুস্পষ্ট প্রমাণের বিরুদ্ধে কাফের ও মুশরিকদের অস্বীকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

কেয়ামত ও মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকৃতি কাফেরদের পক্ষ থেকে যেন এ বিষয়ের দাবী যে, তাদের প্রাণ ও আত্মা তাদেরই করায়ত্ত। তাদের এই ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের জন্যে আলোচ্য আয়াতসমূহে একজন মরনোন্মুখ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, যখন তার আত্মা কণ্ঠাগত হয় আর আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব অসহায়ভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে এবং তারা কামনা করে যে, তার আত্মা বের না হোক, তখন আমি জ্ঞান ও সামর্থ্যের দিক দিয়ে তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটে থাকি। নিকটে থাকার অর্থ এই যে, তার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ও সক্ষম থাকি। কিন্তু তোমরা আমার নৈকট্য ও মরনোন্মুখ ব্যক্তি যে আমার করায়ত্ত এ বিষয়টি চর্মচক্ষে দেখ না। সারকথা এই যে, তোমরা সবাই মিলে তার জীবন ও আত্মার হেফাযত করতে চাও, কিন্তু তোমাদের সাধ্যে কুলায় না। তার আত্মার নির্গমন কেউ রোধ করতে পারে

না। এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে বলা হয়েছে ঃ যদি তোমরা মনে কর যে, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে জীবিত করা যাবে না এবং তোমরা এমন শক্তিশালী ও বীরপুরুষ যে আল্লাহ্‌র নাগালের বাইরে চলে গেছ, তবে এখানেই স্বীয় শক্তিমত্তা ও বীরত্ব পরীক্ষা করে দেখ এবং এই মরনোন্মুখ ব্যক্তির আত্মার নির্গমন রোধ কর কিংবা নির্গমনের পর তাকে পুনরায় দেহে ফিরিয়ে আন। তোমরা যখন এতটুকুও করতে পার না, তখন নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র নাগালের বাইরে মনে করা এবং মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনকে অস্বীকার করা কতটুকু নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ –পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একথা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত হয় কাজকর্মের হিসাব-নিকাশ দিতে হবে এবং হিসাবের পর প্রতিদান ও শাস্তি সুনিশ্চিত। সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, প্রতিদান ও শাস্তির পর সবাই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হবে এবং প্রত্যেকের প্রতিদান আলাদা আলাদা হবে। আলোচ্য আয়াতে তাই আবার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৃত্যুর পর এই ব্যক্তি নৈকট্যশীলদের একজন হলে সুখই সুখ এবং আরামই আরাম ভোগ করবে। আর যদি 'আসহাবুল-ইয়ামীন' তথা সাধারণ মুমিনদের একজন হয়, তবে সেও জান্নাতের অবদান লাভ করবে। পক্ষান্তরে যদি আসহাবে শিমাল' তথা কাফের ও মুশরিকদের একজন হয়, তবে জাহান্নামের অগ্নি ও উত্তপ্ত পানি দ্বারা তাকে আপ্যায়ন করা হবে। পরিশেষে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ — অর্থাৎ উল্লেখিত প্রতিদান ও শাস্তি ধ্রুব সত্য। এতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ সূরার উপসংহারে রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামে পবিত্রতা ঘোষণা করুন। এতে নামাযের ভিতরে ও বাইরের সব তসবীহ্ দাখিল রয়েছে। খোদ নামাযকেও মাঝে মাঝে তসবীহ্ বলে ব্যক্ত করা হয়। এমতাবস্থায় এটা নামাযের প্রতি গুরুত্বদানেরও আদেশ হয়ে যাবে।

সূরা আল-হাদীদ

সূরা হাদীদের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ঃ যে পাঁচটি সূরার শুরুতে سَبَّحَ অথবা يُسَبِّحُ আছে, সেগুলোকে হাদীসে مسبحات তথা তসবীহ্‌যুক্ত সূরা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। সূরা হাদীদ তন্মধ্যে প্রথম। দ্বিতীয় হাশর, তৃতীয় ছফ, চতুর্থ জুমুআ এবং পঞ্চম তাগাবুন। আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসায়ীর রেওয়ায়েতে হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে এসব সূরা পাঠ করতেন। তিনি আরও বলেছেন যে, এসব সূরায় একটি আয়াত এমন আছে, যা হাজার আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ। ইবনে-কাসীর বলেন ঃ সেই শ্রেষ্ঠ আয়াতটি হচ্ছে সূরা হাদীদের এই আয়াত ঃ

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

এই পাঁচটি সূরার মধ্য থেকে তিনটিতে অর্থাৎ, হাদীদ, হাশর ও ছফে سَبَّحَ অতীত পদবাচ্য সহকারে এবং জুমুআ ও তাগাবুনে يُسَبِّحُ ভবিষ্যত পদবাচ্য সহকারে বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত থাকতে পারে যে, আল্লাহ্ তাআলার তসবীহ্ ও যিকর অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সর্বকালেই অব্যাহত থাকা বিধেয়।—(মাযহারী)

শয়তানী কুমন্ত্রণার প্রতিকার ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কোন সময় তোমার অন্তরে আল্লাহ্ তাআলা ও ইসলাম সম্পর্কে শয়তানী কুমন্ত্রণা দেখা দিলে هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ আয়াতখানি আস্তে পাঠ করে নাও। —(ইবনে-কাসীর)

এই আয়াতের তফসীর এবং আউয়াল, আখের, যাহের ও বাতেনের অর্থ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের দশটিরও অধিক উক্তি বর্ণিত আছে। এসব উক্তির মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই — সবগুলোরই অবকাশ আছে। আউয়াল শব্দের অর্থ তো প্রায় নির্দিষ্ট ; অর্থাৎ, অস্তিত্বের দিক দিয়ে সকল সৃষ্টজগতের অগ্রে ও আদি। কারণ, তিনি ব্যতীত সবকিছু তাঁরই সৃজিত। তাই তিনি সবার আদি। কারও কারও মতে আখেরের অর্থ এই যে, সবকিছু বিলীন হয়ে যাওয়ার পরও তিনি বিদ্যমান থাকবেন। যেমন, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ আয়াতে এর পরিষ্কার উল্লেখ আছে। বিলীনতা দুই প্রকার। (এক) যা কার্যতঃ বিলীন হয়ে যায় ; যেমন, কেয়ামতের দিন সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে। (দুই) যা কার্যতঃ বিলীন হয় না, কিন্তু সত্তাগতভাবে বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্ত নয়। এরূপ বস্তুকে বিদ্যমান অবস্থায়ও ধ্বংসশীল বলা যায়। এর উদাহরণ জান্নাত ও দোযখ এবং এগুলোতে প্রবেশকারী ভাল-মন্দ মানুষ। তাদের অস্তিত্ব বিলীন হবে না ; কিন্তু বিলীন হওয়ার আশংকা থেকে মুক্তও হবে না। একমাত্র আল্লাহ্‌র সত্তাই এমন যে, পূর্বেও বিলীন ছিল না এবং ভবিষতেও কখনও বিলীন হবে না। তাই তিনি সবার অন্ত।

ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার মারেফত সবার শেষে হয়। এই দিক দিয়ে তিনি আখের তথা অন্ত। মানুষ জ্ঞান ও মারেফতে ক্রমোন্নতি লাভ করতে থাকে। কিন্তু মানুষের অর্জিত এসব স্তর আল্লাহ্‌র পথের বিভিন্ন মনযিল বৈ নয়। এর চূড়ান্ত ও শেষ সীমা হচ্ছে আল্লাহ্‌র মাফেরত।—(রুহুল-মা'আনী)

'যাহের' বলে সেই সত্তা বোঝানো হয়েছে, যেসব বস্তু অপেক্ষাকৃত অধিক প্রকাশমান। প্রকাশমান হওয়া অস্তিত্বের একটি শাখা। অতএব, আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব যখন সবার উপরে ও অগ্রে, তখন তাঁর আত্মপ্রকাশও সবার উপরে হবে। জগতে তাঁর চাইতে অধিক কোন বস্তু প্রকাশমান নয়। তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তিসামর্থ্যের উজ্জ্বল নিদর্শন বিশ্বের প্রতিটি কণায় কণায় দেদীপ্যমান।

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ ۖ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ
الْأُمُورُ ۝ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۖ وَهُوَ
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا
جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۙ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ
لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝
هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ وَ
مَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَ
الْأَرْضِ ۗ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ
أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

(৪) তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে, অতঃপর আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা ভূমি থেকে নির্গত হয় এবং যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় ও যা আকাশে উত্থিত হয়। তিনি তোমাদের সাথে আছেন তোমরা যেখানেই থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। (৫) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই। সবকিছু তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (৬) তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট করেন এবং দিবসকে প্রবিষ্ট করেন রাত্রিতে। তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত। (৭) তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতএব, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার। (৮) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছ না, অথচ রসূল তোমাদেরকে তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার দাওয়াত দিচ্ছেন? আল্লাহ্ তো পূর্বেই তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছেন—যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (৯) তিনিই তাঁর দাসের প্রতি প্রকাশ্য আয়াত অবতীর্ণ করেন, যাতে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনয়ন করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। (১০) তোমাদেরকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহ্ই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা, যারা পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ্ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ্ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ —অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে আছেন তোমরা যেখানেই থাক না কেন। এই 'সঙ্গের' স্বরূপ ও প্রকৃত অবস্থা মানুষের জ্ঞানসীমার অতীত। কিন্তু এর অস্তিত্ব সুনিশ্চিত। এটা না হলে মানুষের টিকে থাকা এবং তার দ্বারা কোন কাজ হওয়া সম্ভবপর নয়। আল্লাহ্র ইচ্ছা ও শক্তি বলেই সবকিছু হয়। তিনি সর্বাবস্থায় ও সর্বত্র মানুষের সঙ্গে আছেন।

وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ — এর অর্থ আদিকালীন অঙ্গীকারও হতে পারে, যখন আল্লাহ্ তাআলা মখলুককে সৃষ্টি করার পূর্বেই ভবিষ্যতে আগমনকারী সব আত্মাকে একত্রিত করে তাদের কাছ থেকে তিনিই যে তাদের একমাত্র পালনকর্তা একথার স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। কোরআন পাকে أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ বলে এই অঙ্গীকারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সেই অঙ্গীকারও হতে পারে, যা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও তাঁদের উম্মতের কাছ থেকে শেষ নবী (সাঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁকে সাহায্য করা সম্পর্কে নিয়েছিলেন।

إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ — অর্থাৎ, যদি তোমরা মুমিন হও। এখানে প্রশ্ন হয় যে, একথাটি সেই কাফেরদেরকে বলা হয়েছে, যাদেরকে মুমিন না হওয়ার কারণে ইতিপূর্বে وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ বলে সতর্ক করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদেরকে 'তোমরা যদি মুমিন হও' বলা কিরূপে সঙ্গত হতে পারে?

জওয়াব এই যে, কাফের ও মুশরিকরাও আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের দাবী করত। প্রতিমাদের ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ছিল এইযে, مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ -অতএব, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের দাবী যদি সত্য হয়, তবে তার বিশুদ্ধ ও ধর্তব্য পথ অবলম্বন কর। এটা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে রসূলের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে হতে পারে।

وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ - مِيرَاثُ অভিধানে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্তমালিকানাকে বলা হয়ে থাকে। এই মালিকানা বাধ্যতামূলক—মৃত ব্যক্তি ইচ্ছা করুক বা না করুক, ওয়ারিশ ব্যক্তি আপনা-আপনি মালিক হয়ে যায়। এখানে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উপর আল্লাহ্ তাআলার সার্বভৌম মালিকানাকে مِيرَاثُ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার রহস্য এই যে, তোমরা ইচ্ছা কর বা না কর, তোমরা আজ যে যে জিনিসের মালিক বলে গণ্য হও, সেগুলো অবশেষে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ মালিকানায় চলে যাবে। সবকিছুর প্রকৃত মালিক পূর্বেও আল্লাহ্ তা'আলাই ছিলেন, কিন্তু তিনি কৃপাবশতঃ কিছু বস্তুর মালিকানা তোমাদের নামে করে দিয়েছিলেন। এখন তোমাদের সেই বাহ্যিক মালিকানাও অবশিষ্ট থাকবে না। সর্বতোভাবে আল্লাহ্রই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। তাই এই মুহূর্তে যখন বাহ্যিক মালিকানা তোমাদের হাতে আছে, তখন এ থেকে আল্লাহ্র নামে যা ব্যয় করবে, তা পরকালে পেয়ে যাবে। এভাবে যেন আল্লাহ্র পথে ব্যয়কৃত বস্তুর মালিকানা তোমাদের জন্যে চিরস্থায়ী হয়ে যাবে।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একদিন

আমরা একটি ছাগল যবাই করে তার অধিকাংশ গোশত বণ্টন করে দিলাম, শুধু একটি হাত নিজেদের জন্যে রাখলাম। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বণ্টনের পর এই ছাগলের গোশত কতটুকু রয়ে গেছে? আমি আরয করলাম ঃ শুধু একটি হাত রয়ে গেছে। তিনি বললেন ঃ গোটা ছাগলই রয়ে গেছে। তোমার ধারণা অনুযায়ী কেবল হাতই রয়ে যায়নি। কেননা, গোটা ছাগলই আল্লাহ্র পথে ব্যয় হয়েছে। এটা আল্লাহ্র কাছে তোমার জন্যে থেকে যাবে। যে হাতটি নিজের খাওয়ার জন্যে রেখেছ, পরকালে এর কোন প্রতিদান পাবে না। কেননা, এটা এখানেই বিলীন হয়ে যাবে।—(মাযহারী)

আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার প্রতি জোর দেয়ার পর পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র পথে যা কিছু যে কোন সময় ব্যয় করলে সওয়াব পাওয়া যাবে ; কিন্তু ইমান, আন্তরিকতা ও অগ্রগামিতার পার্থক্যবশতঃ সওয়াবেও পার্থক্য হবে। বলা হয়েছে ঃ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ –অর্থাৎ, যারা আল্লাহ্র পথে ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। (এক) যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছে।

(দুই) যারা মক্কাবিজয়ের পর মুমিন হয়ে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছে। এই দুই শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র কাছে সমান নয়; বরং মর্যাদায় একশ্রেণী অপর শ্রেণী থেকে শ্রেষ্ঠ। মক্কাবিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জেহাদকারী ও ব্যয়কারীর মর্যাদা অপর শ্রেণী অপেক্ষা বেশী।

মক্কা বিজয়কে সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদাভেদের মাপকাঠি করার রহস্যঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা সাহাবায়ে-কেরামকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। (এক) যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে মুসলমান হয়ে ইসলামী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং (দুই) যারা মক্কাবিজয়ের পর একাজে শরীক হয়েছেন। আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত সাহাবীগণের মর্যাদা আল্লাহ্ তাআলার কাছে শেষোক্ত সাহাবীগণের তুলনায় বেশী।

সকল সাহাবীর জন্যে মাগফেরাত ও রহমতের সুসংবাদ এবং অবিশষ্ট উম্মত থেকে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদার পারস্পরিক তারতম্য উল্লেখ করে শেষে বলা হয়েছে ঃ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى — অর্থাৎ, পারস্পরিক তারতম্য সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা কল্যাণ অর্থাৎ, জান্নাত ও মাগফেরাতের ওয়াদা সবার জন্যেই করেছেন। এই ওয়াদা সাহাবায়ে-কেরামের সেই শ্রেণীদ্বয়ের জন্যে, যারা মক্কাবিজয়ের পূর্বে ও পরে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করেছেন এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলা করেছেন। এতে সাহাবায়ে-কেরামের প্রায় সমগ্র দলই শামিল আছে। কেননা, তাঁদের মধ্যে এরূপ ব্যক্তি খুবই দুর্লভ, যিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্র পথে কিছুই ব্যয় করেননি এবং ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় অংশগ্রহণ করেননি। তাই মাগফেরাত ও রহমতের এই কোরআনী ঘোষণা প্রত্যেক সাহাবীকে শামিল করেছে।

সাহাবায়ে-কেরামের মর্যাদা কোরআন ও হাদীস দ্বারা জানা যায় ঐতিহাসিক বর্ণনা দ্বারা নয় ঃ সারকথা এই যে, সাহাবায়ে-কেরাম সাধারণ উম্মতের ন্যায় নন। তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও উম্মতের মাঝখানে আল্লাহ্র তৈরী সেতু। তাঁদের মাধ্যম ব্যতীত উম্মতের কাছে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষা পৌছার কোন পথ নেই। তাই ইসলামে তাঁদের বিশেষ একটি মর্যাদা রয়েছে। তাঁদের এই মর্যাদা ইতিহাস গ্রন্থের সত্যমিথ্যা বর্ণনা দ্বারা নয় ; বরং কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যায়।

তাঁদের দ্বারা কোন পদস্খলন বা ভ্রান্তিমূলক কোন কিছু হয়ে থাকলে তা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজতিহাদী ভুল। যে কারণে সেগুলোকে গোনাহের মধ্যে গণ্য করা যায় না। বরং সহীহ্ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী তদ্দ্বারা তাঁরা একটি সওয়াব পাওয়ার অধিকারী। যদি বাস্তবে কোন গোনাহ্ হয়েই যায়, তবে প্রথমতঃ তা তাঁদের সারা জীবনের সৎকর্ম এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও ইসলামের সাহায্য ও সেবার মোকাবেলায় শূন্যের কোঠায় থাকে। দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ছিলেন অসাধারণ খোদাভীরু। সামান্য গোনাহের কারণেও তাঁদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠত। তাঁরা তাৎক্ষণিকভাবে তওবা করতেন এবং নিজের উপর গোনাহের শাস্তি প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হতেন। কেউ নিজেকে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বেঁধে দিতেন এবং তওবা কবুল হওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তদবস্থায়ই দণ্ডায়মান থাকতেন। এছাড়া তাঁদের প্রত্যেকের পুণ্য এত অধিক ছিল যে, সেগুলো দ্বারা গোনাহের কাফফরা হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি আল্লাহ্ তাআলা তাঁদের মাগফেরাতের ব্যাপক ঘোষণা আলোচ্য আয়াতে এবং অন্য আয়াতেও করে দিয়েছেন। শুধু মাগফেরাতই নয় ; رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ বলে তাঁর সন্তুষ্টিরও নিশ্চিত আশ্বাস দান করেছেন। তাই তাঁদের পরস্পরে যেসব মতবিরোধ ও বাদানুবাদের ঘটনা ঘটেছে, সেগুলোর ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে কাউকে মন্দ বলা অথবা দোষারোপ করা নিশ্চিতরূপে হারাম, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী অভিশপ্ত হওয়ার কারণ এবং নিজের ঈমানকে বিপন্ন করার শামিল।

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ
أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ
الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ
نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا ۚ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ
بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾
يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ
تَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ
غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ
الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾
أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ
مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ
عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾ اعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

(১১) কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ধার দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার। (১২) যেদিন আপনি দেখবেন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে, তাদের সম্মুখ ভাগে ও ডানপার্শ্বে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে। বলা হবে : আজ তোমাদের জন্যে সুসংবাদ জান্নাতের, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য। (১৩) যেদিন কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারীরা মুমিনদেরকে বলবে : তোমরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা কর, আমরাও কিছু আলো নিব তোমাদের জ্যোতি থেকে। বলা হবে : তোমরা পিছনে ফিরে যাও ও আলোর খোঁজ কর। অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব। (১৪) তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবে : আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে : হাঁ কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ। প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ, অবশেষে আল্লাহ্‌র আদেশ পৌঁছেছে। এই সবই তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে। (১৫) অতএব, আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কাফেরদের কাছ থেকেও নয়। তোমাদের সবার আবাসস্থল জাহান্নাম। সেটাই তোমাদের সঙ্গী। কতই না নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল। (১৬) যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (১৭) তোমরা জেনে রাখ, আল্লাহ্‌ই ভূ-ভাগকে তার মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করেন। আমি পরিষ্কারভাবে তোমাদের জন্যে আয়াতগুলো ব্যক্ত করেছি, যাতে তোমরা বোঝ।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

অর্থাৎ, সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আপনি মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে দেখবেন যে, তাদের নূর তাদের অগ্রে ও ডানদিকে ছুটোছুটি করবে।

'সেদিন' বলে কেয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। নূর দেয়ার ব্যাপারটি পুলসিরাতে চলার কিছু পূর্বে ঘটবে। হযরত আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে এর বিবরণ রয়েছে। হাদীসটি কিছু দীর্ঘ। এতে আছে যে, আবু উমামা (রাঃ) একদিন দামেশ্‌কে এক জানাযায় শরীক হন। জানাযা শেষে উপস্থিত লোকদেরকে মৃত্যু ও পরকাল স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যে তিনি মৃত্যু, কবর ও হাশরের কিছু অবস্থা বর্ণনা করেন। নিম্নে তাঁর কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ দেয়া হল ঃ

অতঃপর তোমরা কবর থেকে হাশরের ময়দানে স্থানান্তরিত হবে। হাশরের বিভিন্ন মনযিল ও স্থান অতিক্রম করতে হবে। এক মনযিলে আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে কিছু মুখমণ্ডলকে সাদা ও উজ্জ্বল করে দেয়া হবে এবং কিছু মুখমণ্ডলকে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ করে দেয়া হবে। অপর এক মনযিলে সমবেত সব মুমিন ও কাফেরকে গভীর অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিছুই দৃষ্টিগোচর হবে না। এরপর নূর বন্টন করা হবে। প্রত্যেক মুমিনকে নূর দেয়া হবে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মুমিনকে তার আমল পরিমাণে নূর দেয়া হবে। ফলে কারও নূর পর্বতসম, কারও খর্জুর বৃক্ষসম এবং কারও মানবদেহসম হবে। সর্বাপেক্ষা কম নূর সেই ব্যক্তির হবে, যার কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলিতে নূর থাকবে; তাও আবার কখনও জ্বলে উঠবে এবং কখনও নিভে যাবে। — (ইবনে-কাসীর)

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

—অর্থাৎ, মুমিনদের জন্যে কি এখনও সময় আসেনি যে, তাদের অন্তর আল্লাহ্‌র যিকর এবং যে সত্য নাযিল করা হয়েছে তৎপ্রতি নম্র ও বিগলিত হবে?

خشوع قلب — এর অর্থ অন্তর নরম হওয়া, উপদেশ কবুল করা ও আনুগত্য করা। —(ইবনে-কাসীর) কোরআনের প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়ার অর্থ এর বিধান তথা আদেশ ও নিষেধ পুরোপুরি পালনকরার জন্যে প্রস্তুত হওয়া এবং এ ব্যাপারে কোন অলসতা বা দুর্বলতাকে প্রশ্রয় না দেয়া।—(রুহুল-মা'আনী)

এটা মুমিনদের জন্যে হুশিয়ারী। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তাআলা কোন কোন মুমিনদের অন্তরে আমলের প্রতি অলসতা ও অনাসক্তি আঁচ করে এই আয়াত নাযিল করেন। (ইবনে-কাসীর) ইমাম আ'মাশ বলেন ঃ মদীনায় পৌঁছার পর কিছু অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হওয়ায় কোন কোন সাহাবীর কর্মোদ্দীপনায় কিছুটা শৈথিল্য দেখা দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। —(রুহুল-মা'আনী)।

হযরত ইবনে আব্বাসের (রাঃ) উপরোক্ত রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে, এই হুশিয়ারী সংকেত কোরআন অবতরণ শুরু হওয়ার তের বছর পরে নাযিল হয়। সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মসউদ

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ
لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ وَ
الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾ اعْلَمُوا أَنَّمَا
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي
الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ
فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ
مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿٢٠﴾
سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ
الْأَرْضِ ۙ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢١﴾ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ
ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا
آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿٢٣﴾ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ
النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾

(১৮) নিশ্চয় দানশীল ব্যক্তি ও দানশীলা নারী, যারা আল্লাহ্‌কে উত্তমরূপে ধার দেয়, তাদেরকে দেয়া হবে বহুগুণ এবং তাদের জন্যে রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। (১৯) আর যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারাই তাদের পালনকর্তার কাছে সিদ্দীক ও শহীদ বলে বিবেচিত। তাদের জন্যে রয়েছে পুরস্কার ও জ্যোতি এবং যারা কাফের ও আমার নিদর্শন অস্বীকারকারী তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। (২০) তোমরা জেনে রাখ, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য ব্যতীত আর কিছু নয়, যেমন এক বৃষ্টির অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়। (২১) তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মত প্রশস্ত। এটা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদের জন্যে। এটা আল্লাহ্‌র কৃপা, তিনি যাকে ইচ্ছা, এটা দান করেন। আল্লাহ্ মহান কৃপার অধিকারী। (২২) পৃথিবীতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে না ; কিন্তু তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে সহজ। (২৩) এটা এজন্যে বলা হয়, যাতে তোমরা যা হারাও তজ্জন্যে দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তজ্জন্যে উল্লসিত না হও। আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না, (২৪) যারা কৃপণতা করে এবং মানুষকে কৃপণতার প্রতি উৎসাহ দেয়, যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।

(রাঃ) বলেন, আমাদের ইসলাম গ্রহণের চার বছর পর এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদেরকে হুশিয়ার করা হয়।

মোটকথা, এই হুশিয়ারীর সারমর্ম হচ্ছে মুসলমানদেরকে পুরোপুরি নম্রতা ও সৎ কর্মের জন্যে তৎপর থাকার শিক্ষা দেয়া এবং একথা ব্যক্ত যে, আন্তরিক নম্রতাই সৎকর্মের ভিত্তি।

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ মানুষের অন্তর থেকে সর্বপ্রথম নম্রতা উঠিয়ে নেয়া হবে। — (ইবনে-কাসীর)

আনুষঙ্গি জ্ঞাতব্য বিষয়

প্রত্যেক মুমিনই কি সিদ্দীক ও শহীদ? وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, প্রত্যেক মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায়। এই আয়াতের ভিত্তিতে হযরত কাতাদাহ্ ও আমর ইবনে মায়মুন (রাঃ) বলেন, যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই সিদ্দিক ও শহীদ।

হযরত বারা ইবনে আযেবের বাচনিক রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ مؤمنوا امتى شهداء অর্থাৎ আমার উম্মতের সব মুমিন শহীদ। এর প্রমাণ হিসেবে তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন। — (ইবনে-জরীর)

একদিন হযরত আবু হুরায়রার (রাঃ) কাছে কিছুসংখ্যক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন ঃ كلكم صديق وشهيد অর্থাৎ, আপনারা প্রত্যেকেই সিদ্দীক ও শহীদ। সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন ঃ আবু হুরায়রা, আপনি এ কি বলছেন? তিনি জওয়াবে বললেনঃ আমার কথা বিশ্বাস না করলে কোরআনের এই আয়াত পাঠ করুন

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَاءُ

কিন্তু কোরআন পাকের অন্য একটি আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, প্রত্যেক মুমিন সিদ্দীক ও শহীদ নয় ; বরং মুমিনদের একটি উচ্চ শ্রেণীকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা হয়। আয়াতটি এই ঃ

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

এই আয়াতে পয়গম্বরগণের সাথে মুমিনদের তিনটি শ্রেণী বিশেষভাবে উল্লেখিত হয়েছে যথা, সিদ্দীক, শহীদ ও ছালেহ্। বাহ্যতঃ এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী। নতুবা ভিন্ন ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল না। এ কারণেই কেউ কেউ বলেন ঃ সিদ্দীক ও শহীদ প্রকৃতপক্ষে মুমিনদের বিশেষ উচ্চশ্রেণীর লোকগণকে বলা হয়, যারা মহান গুণগরিমার অধিকারী। তবে আলোচ্য আয়াতে সব মুমিনকে সিদ্দীক ও শহীদ বলার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক মুমিনকেও কোন না কোন দিক দিয়ে সিদ্দীক ও শহীদ বলে গণ্য এবং তাঁদের কাতারভুক্ত মনে করা হবে।

রুহুল-মা'আনীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে কামেল ও এবাদতকারী মুমিন অর্থ নেওয়া সঙ্গত। নতুবা যেসব মুমিন অসাবধান ও খেয়ালখুশীতে মগ্ন তাদেরকে সিদ্দীক ও শহীদ বলা যায় না। এক হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন اللعانون لايكونون شهداء অর্থাৎ, যারা মানুষের প্রতি অভিসম্পাত করে তারা শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) একবার উপস্থিত জনতাকে বললেন ঃ

তোমাদের কি হল যে, তোমরা কাউকে অপরের ইয্যতের উপর হামলা করতে দেখেও তাকে বাধা দাও না এবং একে খারাপ মনে কর না? জনতা আরয করল ঃ আমরা কিছু বললে সে আমাদের ইযযতের উপরও হামলা চালাবে এই ভয়ে আমরা কিছু বলি না। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ যারা এমন শিথিল, তারা সেই শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যারা কেয়ামতের দিন পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের উম্মতদের মোকাবেলায় সাক্ষ্য দিবে। — (রুহুল-মা'আনী)

তফসীরে-মাযহারীতে আছে, আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর আমলে যারা ঈমানদার হয়েছে এবং তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভে ধন্য হয়েছে, তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে। আয়াতে هُمُ الصِّدِّيقُونَ বাক্য থেকে বোঝা যায় যে, একমাত্র সাহাবায়ে-কেরামই সিদ্দীক, অন্য কোন মুমিন নয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহঃ) বলেন ঃ সাহাবায়ে-কেরাম সকলেই পয়গম্বরসুলভ গুণগরিমার বাহক ছিলেন। যে ব্যক্তি একবার মুমিন অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে দেখেছে, সেই পয়গম্বরসুলভ গুণগরিমায় আপ্লুত হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের পরকালীন চিরস্থায়ী অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল। মানুষের পরকালের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং আযাবে ধৃত হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী সুখ ও তাতে নিমগ্ন হয়ে পরকাল থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া। তাই আলোচ্য আয়তসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া মোটেই ভরসা করার যোগ্য নয়।

পার্থিব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু হয় এবং যাতে দুনিয়াদার ব্যক্তি মগ্ন ও আনন্দিত থাকে, প্রথমে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ, সংক্ষেপে বলতে গেলে পার্থিব জীবনের মোটামুটি বিষয়গুলো যথাক্রমে এই ঃ প্রথমে ক্রীড়া, এরপর কৌতুক, এরপর সাজ-সজ্জা, এরপর পারস্পরিক অহমিকা, এরপর ধন ও জনের প্রাচুর্য নিয়ে পারস্পরিক গর্ববোধ।

لَعِبٌ শব্দের অর্থ এমন খেলা, যাতে মোটেই উপকার লক্ষ্য থাকে না; যেমন কচি শিশুদের অঙ্গ চালনা। لَهْوٌ এমন খেলাধূলা, যার আসল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন ও সময়ক্ষেপণ হলেও প্রসঙ্গক্রমে ব্যায়াম অথবা অন্য কোন উপকারও অর্জিত হয়ে যায়। যেমন—বড় বালকদের ফুটবল, লক্ষ্যভেদ অর্জন ইত্যাদি খেলা। হাদীসে লক্ষ্যভেদ অর্জন ও সাঁতার অনুশীলনকে উত্তম খেলা বলা হয়েছে। অঙ্গ-সজ্জা, পোশাক ইত্যাদির মোহ সর্বজন বিদিত। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম অংশ ক্রীড়া অর্থাৎ لَعِبٌ এর মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এরপর لَهْوٌ শুরু হয়। এরপর সে অঙ্গসজ্জায় ব্যাপৃত হয় এবং শেষ বয়সে সমসাময়িক ও সমবয়সীদের সাথে প্রতিযোগিতার প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

উল্লেখিত ধারাবাহিকতার প্রতিটি স্তরেই মানুষ নিজ অবস্থা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে এবং একেই সর্বোত্তম জ্ঞান করে। কিন্তু যখন এক স্তর ডিঙিয়ে অন্য স্তরে গমন করে, তখন বিগত স্তরের দুর্বলতা ও অসারতা তার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। বালক-বালিকারা খেলা-ধূলাকে জীবনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ ও সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ধন মনে করে। কেউ কেউ তাদের খেলার সামগ্রী ছিনিয়ে নিলে তারা এত ব্যথা পায়, যেমন বয়স্কদের ধন-সম্পদ, বাড়ীঘর ছিনিয়ে নিলে তারা ব্যথা পায়। কিন্তু এই স্তর অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হলে পর তারা বুঝতে পারে যে, যেসব বস্তুকে তারা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সাব্যস্ত করে নিয়েছিল, সেগুলো ছিল অসার ও অর্থহীন বস্তু। যৌবনে সাজ-সজ্জা ও পারস্পরিক অহমিকাই থাকে জীবনের লক্ষ্য। বার্ধক্যে ধনে ও জনে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। কিন্তু যৌবনে যেমন শৈশবের কার্যকলাপ অসার মনে হয়েছিল, বার্ধক্যে পৌঁছেও তেমনি যৌবনের কার্যকলাপ অনর্থক মনে হতে থাকে। বার্ধক্য হচ্ছে জীবনের সর্বশেষ মনযিল। এ মনযিলে ধন ও জনের প্রাচুর্য এবং জাঁক-জমক ও পদের জন্যে গর্ব জীবনের মহান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কোরআন পাক বলে যে, এই অবস্থাও সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী। এর পরবর্তী দুটি স্তর বরযখ ও কেয়ামতের চিন্তা কর। এগুলোই আসল। অতঃপর কোরআন পাক বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছে ঃ

كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا

غيث শব্দের অর্থ বৃষ্টি। كفار শব্দটি মুমিনের বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হলেও এর অপর আভিধানিক অর্থ কৃষকও হয়। আলোচ্য আয়াতে কেউ কেউ এ অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টি দ্বারা ফসল ও নানা রকম উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়ে যখন সবুজ ও শ্যামল বর্ণ ধারণ করে, তখন কৃষকের আনন্দের সীমা থাকে না। কোন কোন তফসীরবিদ كفار শব্দটিকে প্রচলিত অর্থে ধরে বলেছেন যে, এতে কাফেররা আনন্দিত হয়। এখানে প্রশ্ন হয় যে, সবুজ, শ্যামল ফসল দেখে কাফেররাই কেবল আনন্দিত হয় না, মুসলমানরাও হয়। জওয়াব এই যে, মুমিনের আনন্দ ও কাফেরের আনন্দের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। মুমিন আনন্দিত হলে তার চিন্তাধারা আল্লাহ্ তাআলার দিকে থাকে। সে বিশ্বাস করে যে, এই সুন্দর ফসল আল্লাহ্র কুদরত ও রহমতের ফল। সে একেই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করে না। তার আনন্দের সাথে পরকালের চিন্তাও সদাসর্বদা বিদ্যমান থাকে। ফলে দুনিয়ার অগাধ ধনরত্ন পেয়েও মুমিন কাফেরের ন্যায় আনন্দিত ও মত্ত হয় না। তাই আয়াতে 'কাফের আনন্দিত হয়' বলা হয়েছে।

এরপর এই দৃষ্টান্তের সারসংক্ষেপ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফসল ও অন্যান্য উদ্ভিদ যখন সবুজ শ্যামল হয়ে যায়, তখন দর্শক মাত্রই বিশেষ করে কাফেররা খুবই আনন্দিত ও মত্ত হয়ে উঠে। কিন্তু অবশেষে তা শুষ্ক হতে থাকে। প্রথমে পীতবর্ণ হয়, এরপরে সম্পূর্ণ খড়-কুটায় পরিণত হয়। মানুষও তেমনি প্রথমে তরুতাজা ও সুন্দর হয়। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত এরূপই কাটে। অবশেষে যখন বার্ধক্য আসে, তখন দেহের সজীবতা ও সৌন্দর্য সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায় এবং সবশেষে মরে মাটি হয়ে যায়। দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা বর্ণনা করার পর আবার আসল উদ্দেশ্য—পরকালের চিন্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে পরকালের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ অর্থাৎ,

পরকালে মানুষ এ দু'টি অবস্থার মধ্যে যে-কোন একটির সম্মুখীন হবে। একটি কাফেরদের অবস্থা অর্থাৎ, তাদের জন্যে কঠোর আযাব রয়েছে। অপরটি মুমিনদের অবস্থা; অর্থাৎ, তাদের জন্যে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি রয়েছে।

এরপর সংক্ষেপে দুনিয়ার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ঃ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ — অর্থাৎ, এসব বিষয় দেখা ও অনুধাবন করার পর একজন বুদ্ধিমান ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারে

যে, দুনিয়া একটি প্রতারণার স্থল। এখানকার সম্পদ-প্রকৃত সম্পদ নয়, যা বিপদমুহূর্তে কাজে আসতে পারে। অতঃপর পরকালের আযাব ও সওয়াব এবং দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এরূপ হওয়া উচিত যে, মানুষ দুনিয়ার সুখ ও আনন্দে মগ্ন না হয়ে পরকালের চিন্তা বেশী করবে। পরবর্তী আয়াতে তাই ব্যক্ত করা হয়েছে।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

—অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হও, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর প্রস্থের সমান।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার এক অর্থ এই যে, জীবন, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্যের কোন ভরসা নেই ; অতএব, সৎকাজে শৈথিল্য ও টালবাহানা করো না। এরূপ করলে কোন রোগ অথবা ওযর তোমার সৎকাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে কিংবা তোমার মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে। অতএব এর সারমর্ম এই যে, অক্ষমতা ও মৃত্যু আসার আগেই তুমি সৎকাজের পুঁজি সংগ্রহ করে নাও, যাতে জান্নাতে পৌছতে পার।

অগ্রে ধাবিত হওয়ার দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সৎকাজে অপরের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর। হযরত আলী (রাঃ) তাঁর উপদেশাবলীতে বলেন ঃ তুমি মসজিদে সর্বপ্রথম গমণকারী এবং সর্বশেষ নির্গমনকারী হও। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বলেন ঃ জেহাদে সর্বপ্রথম কাতারে থাকার জন্যে অগ্রসর হও। হযরত আনাস বলেন ঃ জামাতের নামাযের প্রথম তকবীরে উপস্থিত থাকার চেষ্টা কর।—(রুহুল-মা'আনী)

জান্নাতের পরিধি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ এর প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান। সূরা আল-এমরানে এই বিষয়বস্তুর আয়াতে سموات বহুবচন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতি একত্রিত করলে জান্নাতের প্রস্থ হবে। বলাবাহুল্য, প্রত্যেক বস্তুর দৈর্ঘ্য প্রস্থ অপেক্ষা বেশী হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতের বিস্তৃতি সপ্ত আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির চাইতে বেশী عرض শব্দটি কোন সময় কেবল বিস্তৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন দৈর্ঘ্যের বিপরীত অর্থ বোঝানো উদ্দেশ্য থাকে না। উভয় অবস্থাতেই জান্নাতের বিশাল বিস্তৃতিই বোঝা যায়।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ পূর্বের আয়াতে জান্নাত ও তার নেয়ামতসমূহের দিকে অগ্রণী হওয়ার আদেশ ছিল। এতে কেউ ধারণা করতে পারত যে, জান্নাত ও তার অক্ষয় নেয়ামতরাজি মানুষের কর্মের ফল এবং মানুষের কর্মই এর জন্যে যথেষ্ট। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেছেন যে, তোমাদের ক্রিয়াকর্ম জান্নাত লাভের পক্ষে যথেষ্ট কারণ নয় যে, ক্রিয়াকর্মের ফলেই জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। মানুষ দুনিয়াতে যেসব নেয়ামত লাভ করেছে, তার সারাজীবনের সৎকর্ম এগুলোর বিনিময়ও হতে পারে না, জান্নাতের অক্ষয় নেয়ামতরাজির মূল্য তো হওয়া দূরের কথা। অতএব আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহ ও কৃপার বদৌলতেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। মুসলিম ও বোখারী বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ তোমাদের আমল তোমাদের কাউকে মুক্তি দিতে পারে না। সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেন ঃ আপনিও কি তদ্রূপ? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমিও আমার আমল দ্বারা জান্নাত লাভ করতে পারি না— আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও অনুকম্পা হলেই লাভ করতে পারি। — (মাযহারী)

দু'টি পার্থিব বিষয় মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ ও পরকালের চিন্তা থেকে গাফেল করে দেয়। (এক) সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, যাতে লিপ্ত হয়ে মানুষ আল্লাহ্কে ভুলে যায়। এ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। (দুই) বিপদাপদ, এতে জড়িত হয়েও মানুষ মাঝে মাঝে নিরাশ ও আল্লাহ্র স্মরণ থেকে উদাসীন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতসমূহে এ সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا —অর্থাৎ, পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপদাপদ আসে, তা সবই আমি কিতাবে অর্থাৎ, লওহে-মাহ্ফূযে জগৎ সৃষ্টির পূর্বেই লিখে দিয়েছিলাম। পৃথিবীর বিপদাপদ বলে দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, ফসলহানি, বাণিজ্যে ঘাটতি, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, বন্ধু-বান্ধবের মৃত্যু ইত্যাদি এবং ব্যক্তিগত বিপদাপদ বলে সর্বপ্রকার রোগ-ব্যাধি, ক্ষত, আঘাত ইত্যাদি বোঝানো হয়েছে।

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ —আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে মানুষ যা কিছু বিপদ অথবা সুখ, আনন্দ অথবা দুঃখের সম্মুখীন হয়, তা সবই আল্লাহ্ তাআলা লওহে-মাহ্ফূযে মানুষের জন্মের পূর্বেই লিখে রেখেছেন। এ বিষয়ের সংবাদ তোমাদেরকে এজন্যে দেয়া হয়েছে, যাতে তোমরা দুনিয়ার ভাল-মন্দ অবস্থা নিয়ে বেশী চিন্তা-ভাবনা না কর। দুনিয়ার কষ্ট ও বিপদাপদ তেমন আক্ষেপ ও পরিতাপের বিষয় নয় এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং অর্থসম্পদ তেমন উল্লাসিত ও মত্ত হওয়ার বিষয় নয় যে, এগুলোতে মশগুল হয়ে তোমরা আল্লাহ্র স্মরণ ও পরকাল সম্পর্কে গাফেল হয়ে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক মানুষ স্বভাবগতভাবে কোন কোন বিষয়ের কারণে আনন্দিত এবং কোন কোন বিষয়ের কারণে দুঃখিত হয়। কিন্তু যা উচিত তা এই যে, বিপদের সম্মুখীন হলে সবর করে পরকালের পুরস্কার ও সওয়াব অর্জন করতে হবে এবং সুখ ও আনন্দের সম্মুখীন হলে কৃতজ্ঞ হয়ে পুরস্কার ও সওয়াব হাসিল করতে হবে। (রুহুল-মা'আনী)

পরবর্তী আয়াতে সুখ ও ধন-সম্পদের কারণে উদ্ধত্য ও অহংকারীদের নিন্দা করা হয়েছে ঃ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ —অর্থাৎ, আল্লাহ্র উদ্ধত্য অহংকারীকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়ার নেয়ামত পেয়ে যারা অহংকার করে, তারা আল্লাহ্র কাছে ঘৃণার্হ। কিন্তু পছন্দ করেন না, বলার মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হল প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্র পছন্দ ও অপছন্দের চিন্তা। তাই এখানে অপছন্দ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ
بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ
رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ
إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ ۖ
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا
بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ
اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ
فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ
كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ
وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ
عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ
يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

(২৫) আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ্ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২৬) আমি নূহ ও ইবরাহীমকে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি এবং তাদের বংশধরের মধ্যে নবুওয়ত ও কিতাব অব্যাহত রেখেছি। অতঃপর তাদের কতক সৎপথপ্রাপ্ত হয়েছে এবং অধিকাংশই হয়েছে পাপাচারী। (২৭) অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি আমার রসূলগণকে এবং তাদের অনুগামী করেছি মরিয়ম তনয় ঈসাকে ও তাকে দিয়েছি ইঞ্জীল। আমি তার অনুসারীদের অন্তরে স্থাপন করেছি নম্রতা ও দয়া। আর বৈরাগ্য, সে তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করেছে ; আমি এটা তাদের উপর ফরয করিনি ; কিন্তু তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এটা অবলম্বন করেছে। অতঃপর তারা যথাযথভাবে তা পালন করেনি। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী ছিল, আমি তাদেরকে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দিয়েছি। আর তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (২৮) মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি নিজ অনুগ্রহের দ্বিগুণ অংশ তোমাদেরকে দিবেন, তোমাদেরকে দিবেন জ্যোতি, যার সাহায্যে তোমরা চলবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়। (২৯) যাতে কিতাবধারীরা জানে যে, আল্লাহ্র সামান্য অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন ক্ষমতা নেই, দয়া আল্লাহ্রই হাতে ; তিনি যাকে ইচ্ছা, তা দান করেন। আল্লাহ্ মহা অনুগ্রহশীল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ঐশী কিতাব ও পয়গম্বর প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা ঃ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ

بينات শব্দের আভিধানিক অর্থ সুস্পষ্ট বিষয়। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট বিধানাবলীও হতে পারে ; যেমন তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এর উদ্দেশ্য মোজেযা এবং রেসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদিও হতে পারে। —(ইবনে-কাসীর) পরবর্তী বাক্যে কিতাব নাযিলের আলাদা উল্লেখ বাহ্যতঃ শেষোক্ত তফসীরের সমর্থক। অর্থাৎ, بينات বলে মোজেযা ও প্রমাণাদি বোঝানো হয়েছে এবং বিধানাবলীর জন্যে কিতাব নাযিল করার কথা বলা হয়েছে।

কিতাবের সাথে 'মীযান' নাযিল করারও উল্লেখ আছে। মীযানের আসল অর্থ পরিমাপযন্ত্র। প্রচলিত দাঁড়িপাল্লা ছাড়া বিভিন্ন বস্তু ওজন করার জন্যে নবাবিষ্কৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিও 'মীযান'-এর অর্থে শামিল আছে ; যেমন আজকাল আলো, উত্তাপ ইত্যাদির পরিমাপযন্ত্র প্রচলিত আছে।

আয়াতে কিতাবের ন্যায় মীযানের বেলায়ও নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। কিতাব নাযিল হওয়া এবং ফেরেশতার মাধ্যমে পয়গম্বরগণ পর্যন্ত পৌঁছা সুবিদিত। কিন্তু মীযান নাযিল করার অর্থ কি ? এ সম্পর্কে তফসীরে রূহুল-মা'আনী, মাযহারী ইত্যাদিতে বলা হয়েছে যে, মীযান নাযিল করার মানে দাঁড়িপাল্লার ব্যবহার ও ন্যায়বিচার সম্পর্কিত বিধানাবলী নাযিল করা। কুরতুবী বলেন ঃ প্রকৃতপক্ষে কিতাবই নাযিল করা হয়েছে, কিন্তু এর সাথে দাঁড়িপাল্লা স্থাপন ও আবিষ্কারকে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আরবদের বাকপদ্ধতিতে এর নজীর বিদ্যমান আছে। কাজেই আয়াতের অর্থ যেন এরূপ انزلنا الكتاب ووضعنا الميزان অর্থাৎ, আমি কিতাব নাযিল করেছি ও দাঁড়িপাল্লা উদ্ভাবন করেছি। সূরা আর-রহমানের وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ আয়াত থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এখানে ميزان শব্দের সাথে وضع শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, নূহ (আঃ)-এর প্রতি আক্ষরিক অর্থে আকাশ থেকে দাঁড়িপাল্লা নাযিল করা হয়েছিল এবং আদেশ করা হয়েছিল যে, এর সাহায্যেও ওজন করে দায়-দেনা পূর্ণ করতে হবে।

কিতাব ও মীযানের পর লৌহ নাযিল করার কথা বলা হয়েছে। এখানেও নাযিল করার মানে সৃষ্টি করা। কোরআন পাকের এক আয়াতে চতুষ্পদ জন্তুদের বেলায়ও নাযিল করা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ চতুষ্পদ জন্তু আসমান থেকে নাযিল হয় না —পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। সেখানেও সৃষ্টি করার অর্থ বোঝানো হয়েছে। তবে সৃষ্টি করাকে নাযিল করা শব্দে ব্যক্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, সৃষ্টির বহুপূর্বেই লওহে-মাহ্ফুযে লিখিত ছিল—এ দিক দিয়ে দুনিয়ার সবকিছুই আসমান থেকে অবতীর্ণ। —(রূহুল-মা'আনী)

আয়াতে লৌহ নাযিল করার দু'টি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) এর ফলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে

খোদায়ী বিধান ও ন্যায়নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। (দুই) এতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকব্জা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোন শিল্প চলতে পারে না।

এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ এবং ন্যায়নীতির দাঁড়িপাল্লা আবিষ্কার ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ অর্থাৎ, মানুষ যাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্যও প্রকৃতপক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা, পয়গম্বরগণও আসমানী কিতাবসমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না, তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান। মীযান ইনসাফের সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হঠকারী, তারা কোন প্রমাণ মানে না এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা সুদূরপরাহত। তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারির কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করে।

এখানে আরও লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, কোরআন পাক ইনসাফ ও সুবিচার দেনা-পাওনা পরিশোধ ও তাতে হ্রাসবৃদ্ধির নিষেধাজ্ঞা জানা যায় এবং মীযান দ্বারা অপরের দেনা-পাওনায় অংশ নির্ধারিত হয়। এই বস্তুদ্বয় নাযিল করার লক্ষ্যই হচ্ছে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। এরপর শেষের দিকে লৌহের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকল্পে লৌহের ব্যবহার বেগতিক অবস্থায় করতে হবে। এটা ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার আসল উপায় নয়।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষকে ন্যায় ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত করা প্রকৃতপক্ষে চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষার মাধ্যমে হয়। রাষ্ট্রের তরফ থেকে জোর-জবরদস্তি প্রকৃতপক্ষে এ কাজের জন্যে নয়; বরং পথের বাধা দূর করার জন্যে বেগতিক অবস্থায় হয়ে থাকে। চিন্তাধারার লালন ও শিক্ষা-দীক্ষাই আসল বিষয়।

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ রূহুল-মা'আনীতে আছে এখানে واو অব্যয়টি এই বাক্যকে একটি উহ্য বাক্যের সাথে সংযুক্ত করার জন্যে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ لينفعهم -আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি লৌহ সৃষ্টি করেছি, যাতে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয়, মানুষ এর দ্বারা শিল্পকাজে উপকৃত হয় এবং আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে আল্লাহ্ জেনে নেন কে লৌহের সমরাস্ত্র দ্বারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে ও ধর্মের জন্যে জিহাদ করে। আইনগতভাবে ও বাহ্যিকভাবে বলার কারণ এই যে, আল্লাহ্ তাআলা ব্যক্তিগতভাবে সবকিছু পূর্বেই জানেন। কিন্তু মানুষ কাজ করার পর তা আমলনামায় লিখিত হয়। এর মাধ্যমেই কাজটি আইনগত প্রকাশ লাভ করে।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পার্থিব হেদায়েত ও পৃথিবীতে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে পয়গম্বর প্রেরণ এবং তাঁদের সাথে কিতাব ও মীযান অবতারণ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাঁদের মধ্যথেকে বিশেষ বিশেষ পয়গম্বরের বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথমে দ্বিতীয় আদম হযরত নূহ (আঃ)-এর এবং পরে পয়গম্বরগণের শ্রদ্ধাভাজন ও মানবমণ্ডলীর ইমাম হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর সাথে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভবিষ্যতে যত পয়গম্বর ও ঐশী কিতাব দুনিয়াতে আগমন করবে, তাঁরা সব এঁদেরই বংশধরের মধ্য থেকে হবে। অর্থাৎ, নূহ (আঃ)-এর সেই শাখাকে এই গৌরব অর্জনের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যাতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন। এ কারণেই পরবর্তীকালে যত পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন এবং যত কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁরা সব ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর।

এই বিশেষ আলোচনার পর পয়গম্বরগণের সমগ্র পরম্পরাকে একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে ব্যক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا অর্থাৎ, এরপর তাঁদের পশ্চাতে একের পর এক আমি আমার পয়গম্বরগণকে প্রেরণ করেছি। পরিশেষে বিশেষভাবে বনী-ইসরাঈলের সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত ঈসা (আঃ)-এর উল্লেখ করে শেষনবী মুহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর শরীয়ত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী হাওয়ারীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً —অর্থাৎ, যারা হযরত ঈসা (আঃ) অথবা ইঞ্জীলের অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে স্নেহ ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছি। তারা একে অপরের প্রতি দয়া ও করুণাশীল কিংবা সমগ্র মানবমণ্ডলীর প্রতি তারা অনুগ্রহশীল। رأفت ও رحمت শব্দদ্বয়কে সমঅর্থবোধক মনে করা হয়। এখানে ভিন্নমুখী করে উল্লেখ করায় কেউ কেউ বলেন ঃ رأفة এর অর্থ অতি দয়া। সাধারণ দয়ার চাইতে এতে যেন আতিশয্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ কারও প্রতি দয়া করার দু'টি অভ্যাসগত কারণ থাকে। এক, সে কষ্টে পতিত থাকলে তার কষ্ট দূর করে দেয়া। একে رأفة বলা হয়। দুই, কোন বস্তুর প্রয়োজন থাকলে তাকে দান করা। একে رحمت বলা হয়। মোটকথা رأفة এর সম্পর্ক ক্ষতি দূর করার সাথে এবং رحمت এর সম্পর্ক উপকার অর্জনের সাথে। ক্ষতি দূর করাকে সবদিক দিয়ে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তাই এই শব্দদ্বয় একত্রে ব্যবহৃত হলে رأفت কে অগ্রে আনা হয়।

এখানে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাহাবী তথা হাওয়ারীগণের দু'টি বিশেষ গুণ رأفت ও رحمت উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাহাবায়ে-কেরামের কয়েকটি বিশেষ গুণ সূরা ফাত্হ-এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ কিন্তু এর আগে সাহবায়ে-কেরামের আরও একটি বিশেষ গুণ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ও বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ, তাঁরা কাফেরদের প্রতি বজ্রকঠোর। পার্থক্যের কারণ এই যে, ঈসা (আঃ)-এর শরীয়তে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের বিধান ছিল না। তাই কাফেরদের বিপক্ষে কঠোরতা প্রকাশ করার কোন স্থানই সেখানে ছিল না।

সন্ন্যাসবাদের অর্থঃ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا - رهبانية শব্দটি رهبان - এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত। راهب ও رهبان - এর অর্থ যে ভয় করে। হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর বনী-ইসরাঈলের মধ্যে পাপাচার ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষতঃ রাজন্যবর্গ ও শাসকশ্রেণী ইঞ্জীলের বিধানাবলীর প্রতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে কিছুসংখ্যক খাঁটি আলেম ও সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা এই ধর্মবিমুখতাকে রুখে দাঁড়ালে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। যে কয়েকজন প্রাণে বেঁচে গেলেন তারা দেখলেন যে, মোকাবেলার শক্তি তাঁদের নেই;

কিন্তু এদের সাথে মিলে-মিশে থাকলে তাঁদের দ্বীন-ঈমান বরবাদ হয়ে যাবে। তাই তাঁরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের জন্যে জরুরী করে নিলেন যে, তারা এখন থেকে বৈধ আরাম-আয়েশও বিসর্জন দিবেন, বিবাহ করবেন না, খাওয়া-পরা এবং ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ করার চিন্তা করবেন না, বসবাসের জন্যে গৃহ নির্মাণে যত্নবান হবেন না, লোকালয় থেকে দূরে কোন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে জীবন অতিবাহিত করবেন অথবা যাযাবরদের ন্যায় ভ্রমণ ও পর্যটনে জীবন কাটিয়ে দিবেন যাতে ধর্মের বিধি-বিধান স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশে পালন করা যায়। তারা আল্লাহ্‌র ভয়ে এই কর্ম পন্থা অবলম্বন করেছিলেন ; তাই তাঁরা راهب অথবা رهبان তথা সন্ন্যাসী নামে অভিহিত হল এবং তাঁদের উদ্ভাবিত মতবাদ رهبانيت তথা সন্ন্যাসবাদ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

তাদের এই মতবাদ পরিস্থিতির চাপে অপারক হয়ে নিজেদের ধর্মের হেফাযতের জন্যে ছিল। তাই এটা মূলতঃ নিন্দনীয় ছিল না। তবে কোন বিষয়কে আল্লাহ্‌র জন্যে নিজেদের উপর অপরিহার্য করে নেয়ার পর তাতে ত্রুটি ও বিরুদ্ধাচরণ করা গুরুতর পাপ। উদাহরণতঃ মানত আসলে কারও উপর ওয়াজিব ও অপরিহার্য নয়। কোন ব্যক্তি নিজে কোন বস্তুকে মানত করতঃ নিজের উপর হারাম অথবা ওয়াজিব করে নিলে শরীয়তের আইনে তা পালন করা ওয়াজিব এবং বিরুদ্ধাচরণ করা গোনাহ্ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কতক লোক সন্ন্যাসবাদের নামের আড়ালে দুনিয়া উপার্জন ও ভোগ বিলাসে মত্ত হয়ে পড়ে। কেননা, জনসাধারণ তাদের ভক্ত হয়ে যায় এবং হাদিয়া ও নযর-নিয়ায আগমন করতে থাকে। তাদের চারপাশে নারী-পুরুষের ভিড় জমতে থাকে। ফলে বেহায়াপনাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে কোরআন পাক এ বিষয়েই তাদের সমালোচনা করেছে যে, তারা নিজেরাই নিজেদের উপর ভোগ বিলাস বিসর্জন দেয়া অপরিহার্য করে নিয়েছিল—আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফরয করা হয়নি। এমতাবস্থায় তাদের উচিত ছিল এটা পালন করা, কিন্তু তারা তাও ঠিকমত পালন করতে পারেনি।

তাদের এই কর্মপন্থা মূলতঃ নিন্দনীয় ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)- এর হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে-কাসীর বর্ণিত এই হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন ঃ বনী-ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে মাত্র তিনটি দল আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছে। প্রথম দলটি হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর অত্যাচারী রাজন্যবর্গ ও ঐশ্বর্যশালী পাপাচারীদেরকে পূর্ণ শক্তি সহকারে রুখে দাঁড়ায়, সত্যের বাণী সর্বোচ্চে তুলে ধরে এবং ধর্মের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়। কিন্তু অশুভ শক্তির মোকাবেলায় পরাজিত হয়ে তারা নিহত হয়। তাদের স্থলে অপর একদল দণ্ডায়মান হয়। তাদের মোকাবেলা করার এতটুকুও শক্তি ছিল না, কিন্তু তারা জীবনপণ করে মানুষকে সত্যের দাওয়াত দেয়। পরিণামে তাদেরকেও হত্যা করা হয়। কতককে করাত দ্বারা চিরা হয় এবং কতককে জীবন্ত অবস্থায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় বিপদাপদে সবর করে। এই দলটিও মুক্তি পেয়েছে, এরপর তৃতীয় দল তাদের জায়গায় আসে। তাদের মধ্যে মোকাবেলারও শক্তি ছিল না এবং পাপাচারীদের সাথে থেকে নিজেদের ধর্ম বরবাদ করারও তারা পক্ষপাতী ছিল না। তাই তারা জঙ্গল ও পাহাড়ের পথ বেছে নেয় এবং সন্ন্যাসী হয়ে যায়। আল্লাহ্ তাআলা وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ আয়াতে তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায় যে, বনী-ইসরাঈলের মধ্যে যারা সন্ন্যাসবাদ অবলম্বন করে তা যথাযথভাবে পালন করেছে এবং বিপদাপদে সবর করেছে, তারাও মুক্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

আলোচ্য আয়াতের এই তফসীরের সারমর্ম এই যে, যে ধরনের সন্ন্যাসবাদ প্রথমে তারা অবলম্বন করেছিল, তা নিন্দনীয় ও মন্দ ছিল না। তবে সেটা শরীয়তের বিধানও ছিল না। তারা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর তা জরুরী করে নিয়েছিল। কিন্তু জরুরী করার পর কেউ কেউ একে যথাযথভাবে পালন করেনি। এখান থেকেই এর নিন্দনীয় ও মন্দ দিক শুরু হয়। যারা পালন করেনি, তাদের সংখ্যাই বেশী হয়ে গিয়েছিল। তাই অধিকাংশের কাজকে সবার কাজ ধরে নিয়ে কোরআন গোটা বনী-ইসরাঈল সম্পর্কে মন্তব্য করেছে যে, তারা যে সন্যাসবাদকে নিজেদের উপর জরুরী করে নিয়েছিল, তা যথাযথ পালন করেনি

فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا

এ থেকে আরও জানা গেল যে, ابتدعوا শব্দটি بدعت থেকে উদ্ভূত হলেও এস্থলে এর আভিধানিক অর্থ বোঝানো হয়েছে ; অর্থাৎ, উদ্ভাবন করা। এখানে পারিভাষিক বিদআত বোঝানো হয়নি, যে সম্পর্কে হাদীসে আছে كل بدعة ضلالة অর্থাৎ, প্রত্যেক বিদআতই পথভ্রষ্টতা।

কোরআন পাকের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করলে উপরোক্ত ব্যাখ্যার সত্যতা ফুটে উঠে। সর্বপ্রথম এই বাক্যের প্রতিই লক্ষ্য করুন ঃ

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً

এখানে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় নেয়ামত প্রকাশ করার জায়গায় বলেছেনঃ আমি তাদের অন্তরে স্নেহ, দয়া ও সন্ন্যাসবাদ সৃষ্টি করেছি। এ থেকে বোঝা যায় যে, স্নেহ ও দয়া যেমন নিন্দনীয় নয়, তেমনি তাদের অবলম্বিত সন্ন্যাসবাদও সত্তাগতভাবে নিন্দনীয় ছিল না। নতুবা এ স্থলে একে স্নেহ ও দয়ার সাথে উল্লেখ করার কোন কারণ ছিল না। এ কারণেই যারা সন্ন্যাসবাদকে সর্বাবস্থায় দূষণীয় মনে করেন, তাদেরকে এ স্থলে বাক্যের সাথে رهبانية শব্দটির সংযুক্তির ব্যাপারে অনাবশ্যক ব্যাকরণিক হেরফেরের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তারা বলেন যে, এখানে رهبانية শব্দের আগে ابتدعوا বাক্যটি উহ্য আছে। ইমাম কুরতুবী তাই বলেছেন। কিন্তু উপরোক্ত তফসীর অনুযায়ী এই হেরফেরের কোন প্রয়োজন থাকে না। এরপরও কোরআন পাক তাদের এই উদ্ভাবনের কোনরূপ বিরূপ সমালোচনা করেনি ; বরং সমালোচনা এ বিষয়ের কারণে করা হয়েছে যে, তারা নিজেদের উদ্ভাবিত এই সন্যাসবাদ যথাযথ পালন করেনি। এটাও ابتداع শব্দটিকে আভিধানিক অর্থে নিলেই সম্ভবপর। পারিভাষিক অর্থে হলে কোরআন স্বয়ং এর বিরূপে সমালোচনা করত। কেননা, পারিভাষিক বিদআতও একটি পথভ্রষ্টতা।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর পূর্বোক্ত হাদীসেও সন্ন্যাসবাদ অবলম্বনকারী দলকে মুক্তিপ্রাপ্ত দল গণ্য করা হয়েছে। তারা যদি পারিভাষিক বিদআতের অপরাধে অপরাধী হত, তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়—পথভ্রষ্টদের মধ্যে গণ্য হত।

সন্ন্যাসবাদ সর্বাবস্থায়ই কি নিন্দনীয় ও অবৈধ ঃ বিশুদ্ধ কথা এই যে, رهبانية শব্দের সাধারণ অর্থ হচ্ছে, ভোগ-বিলাস বিসর্জন ও অবৈধ কাজ-কর্ম বর্জন। এর কয়েকটি স্তর আছে। (এক) কোন অনুমোদিত ও হালাল বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যতঃ হারাম সাব্যস্ত করা। এই অর্থে সন্ন্যাসবাদ নিশ্চিত হারাম। কারণ, এটা ধর্মের পরিবর্তন ও বিকৃতি।

কোরআন পাকের يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ আয়াত এবং এ ধরনের অন্যান্য আয়াতে এ বিষয়েই নিষেধাজ্ঞা ও অবৈধতা বিধৃত হয়েছে। এই আয়াতে لَا تُحَرِّمُوا শব্দটিই ব্যক্ত করছে যে, এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র হালালকৃত বস্তুকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যতঃ হারাম সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহ্‌র বিধানাবলী পরিবর্তন ও বিকৃত করার নামান্তর।

(দুই) অনুমোদিত কাজকর্মকে বিশ্বাসগতভাবে অথবা কার্যত ঃ হারাম সাব্যস্ত করে না, কিন্তু কোন কোন পার্থিব কিংবা ধর্মীয় প্রয়োজনের খাতিরে অনুমোদিত কাজ বর্জন করে। পার্থিব প্রয়োজন যেমন কোন রোগব্যাধির আশংকা করে কোন অনুমোদিত বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকা এবং ধর্মীয় প্রয়োজন—যেমন, পরিণামে কোন গোনাহে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকায় কোন বৈধ কাজ বর্জন করা। উদাহরণতঃ মিথ্যা, পরনিন্দা ইত্যাদি গোনাহ্‌ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কেউ মানুষের সাথে মেলামেশাই বর্জন করে ; কিংবা কোন কুস্বভাবের প্রতিকারার্থে কিছুদিন পর্যন্ত কোন কোন বৈধ কাজ বর্জন করতঃ তা ততদিন অব্যাহত রাখা, যতদিন কুস্বভাব সম্পূর্ণ দূর না হয়ে যায়। সূফী বুযুর্গগণ মুরীদকে কম আহার, কম নিদ্রা ও কম মেলামেশার জোর আদেশ দেন। কারণ, এটা প্রবৃত্তি বশীভূত হয়ে গেলে এবং অবৈধতায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা দূর হয়ে গেলে এই সাধনা ত্যাগ করা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে সন্যাসবাদ নয় ; বরং তাক্‌ওয়া, যা ধর্মপরায়ণদের কাম্য এবং সাহাবী, তাবেয়ী ও ইমামগণ থেকে প্রমাণিত।

(তিন) কোন অবৈধ বিষয়কে যেভাবে ব্যবহার করা সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত আছে সেইরূপ ব্যবহার বর্জন করা এবং একেই সওয়াব ও উত্তম মনে করা। এটা এক প্রকার বাড়াবাড়ি, যা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)–এর অনেক হাদীসে নিষিদ্ধ। এক হাদীসে আছে لا رهبانية فى الاسلام অর্থাৎ, ইসলামে সন্ন্যাসবাদ নেই। এতে এই তৃতীয় স্তরের বর্জনই বোঝানো হয়েছে। বনী-ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে যে সন্যাসবাদের গোড়াপত্তন হয়, তা ধর্মের হেফাযতের প্রয়োজনে হলে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ, তাকওয়ার মধ্যে দাখিল। কিন্তু কিতাবধারীদের মধ্যে ধর্মের ব্যাপারে যথেষ্ট বাড়াবাড়ি ছিল। এই বাড়াবাড়ির ফলে তারা প্রথম স্তর অর্থাৎ, হালালকে হারাম করা পর্যন্ত পৌঁছে থাকলে তারা হারাম কাজ করেছে। আর তৃতীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছে থাকলেও এক নিন্দনীয় কাজের অপরাধী হয়েছে।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ — এই আয়াতে হযরত ঈসা (আঃ)- এর প্রতি বিশ্বাসী কিতাবধারী মুমিনগণকে সম্বোধন করা হয়েছে। يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا বলে কেবল মুসলমানগণকে সম্বোধন করাই কোরআন পাকের সাধারণ রীতি। ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের বেলায় 'আহ্‌লে কিতাব' শব্দ ব্যবহার করা হয়। কেননা, রসূলুল্লাহ্‌ (আঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু মূসা (আঃ) ও ঈসা (আঃ)- এর প্রতি তাদের বিশ্বাস যথেষ্ট ও ধর্তব্য নয়। কাজেই তারা الَّذِينَ آمَنُوا কথিত হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে এই সাধারণ রীতির বিপরীতে খ্রীষ্টানদের জন্য الَّذِينَ آمَنُوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবত ঃ এর রহস্য এই যে, পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে রসূলুল্লাহ্‌ (আঃ)- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার আদেশ দেয়া হয়েছে। কারণ, এটাই হযরত ঈসা (আঃ)–এর প্রতি বিশুদ্ধ বিশ্বাসের দাবী। তারা যদি তা করে, তবে তারা উপরোক্ত সম্বোধনের যোগ্য হয়ে যাবে।

অতঃপর রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার ও সওয়াব দানের ওয়াদা করা হয়েছে। এক সওয়াব হযরত মূসা (আঃ) অথবা ঈসা (আঃ)- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ও তাঁদের শরীয়ত পালন করার এবং দ্বিতীয় সওয়াব শেষনবী (সাঃ)–এর প্রতি ঈমান ও তাঁর শরীয়ত পালন করার এতে ইঙ্গিত আছে যে, ইহুদী ও খৃষ্টানরা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত আছে যে, ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)- এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত কাফের ছিল এবং কাফেরদের কোন এবাদত গ্রহণীয় নয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছিল যে, বিগত শরীয়তানুযায়ী তাদের সব কাজকর্ম নিষ্ফল হয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াত ব্যক্ত করেছে যে, কাফের মুসলমান হয়ে গেলে তার কাফের অবস্থায় কৃত সব সৎকর্ম বহাল করে দেয়া হয়। ফলে সে দুই সওয়াবের অধিকারী হয়।

لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ এখানে لا অতিরিক্ত। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, উল্লেখিত বিধানাবলী এজন্যে বর্ণনা করা হল, যাতে কিতাবধারীরা জেনে নেয় যে, তারা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে কেবল ঈসা (আঃ)–এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই আল্লাহ্‌ তাআলার কৃপা লাভের যোগ্য নয়। যদি তারা নিজেদের বর্তমান অবস্থা পরিবর্তন করে এবং রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)–এর প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করে, তবেই তারা আল্লাহ্‌র কৃপালাভে সমর্থ হবে।

সূরা হাদীদ সমাপ্ত।